জল পড়ে পাতা নড়ে

এক বিমানযাত্রায় মিলান কুন্ডেরা ও মিলন কুণ্ডু

মুহম্মদ জুবায়ের

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি নিউ ইয়র্কে। শহর নিউ ইয়র্ক নয়, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অলবানি শহরে। রাজ্যের রাজধানী বলে কিছু কৌলিন্য দাবি করতে পারে, না হলে গাড়িতে চার-পাঁচ ঘণ্টা দূরত্বের বিশাল নিউ ইয়র্ক শহরের তুলনায় এই শহরটি নিতান্ত মলিন ও অনুজ্জ্বল। অলবানিতে আগে কখনো যাওয়া হয়নি। ঘরকুনো অলস মানুষ আমি, ছুটির দিনেও বাইরের চেয়ে ঘরে থাকাই আমার বেশি পছন্দের। প্রয়োজনে এবং শখে বা কমবয়সে ঝোঁকের বশে কিছু ভ্রমণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু ভ্রমণের নেশা কোনোকালে ছিলো না, এখনো নেই। কেউ কেউ আছেন, যাঁদের পায়ের তলায় নাকি শর্ষে থাকে, এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না, বেড়ানোর নামে নেচে ওঠেন। আমার পিতা ছিলেন এই প্রজাতির মানুষ। অনেকবার দেখা জায়গায়ও আরেকবার যেতে আপত্তি নেই। ভ্রমণ বলে কথা। অথচ নতুন কোথাও যাওয়ার উত্তেজনা আমার বড়ো একটা হয় না। বরং অচেনা জায়গা নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা থাকে।

ডালাস থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার ফ্লাইট। আগের রাতে গোছগাছ করার সময় একটি বই ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম – মিলান কুন্ডেরার *দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বীয়িং*। প্লেন আকাশে উড়লে বইটি বের করি। পেপারব্যাক সংস্করণের বইয়ের নামটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। কী অসাধারণ সুন্দর একটি নাম। অনুবাদে এই নামের যুতসই বাংলা নামকরণ কী হতে পারে? অস্তিত্বের দুঃসহ নির্ভারতা? দুঃসহ শব্দটির তীব্রতা বড়ো বেশি, অবহ (রজনীকান্তের *এ জীবনভার হয়েছে অবহ* পংক্তিটি স্মরণ করা যায়) হলে কেমন হয়? নির্ভারতা শব্দটিও কাঠ-কাঠ। লঘুতা বললে নামকরণের আবহটি অক্ষুণ্ন থাকে বলে মনে হয় না। লঘুভার বললে কেমন হয়? অস্তিত্বের এই অবহ লঘুভার। চলতে পারে। কুন্ডেরার মূল উপন্যাসটি চেক ভাষায়। মূল নামকরণের ইংরেজি অনুবাদটি কতোখানি উপযুক্ত হয়েছিলো, তা বিচার করার উপায় নেই। সুতরাং আমার মনে মনে অনূদিত নামটি খুব মানানসই না হলে কী আর করা! লেখকের নামটিও মনে মনে বঙ্গানুবাদ করে ফেলি – মিলন কুণ্ডু।

তা কুণ্ডুবাবুর এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে অনূদিত হয়েছে হলিউডে বেশ আগেই। আমার দেখা হয়নি। বইটি পড়ার পরে এক বন্ধুর কাছে শোনা, বেশ রগরগে ধরনের উত্তেজক ছবি তৈরি করেছিলেন কোনো অল্পপ্রাণ (বন্ধুর ভাষায় লেসার সৌল) চলচ্চিত্রকার। উপন্যাসটিতে সে ধরনের উপাদান প্রচুর আছে বটে, কিন্তু তা মূল প্রতিপাদ্য নয়। বাণিজ্যসফল ছবি তৈরির জন্যে কেউ যে সহজ-উত্তেজক বিষয়গুলোই চলচ্চিত্রায়িত করবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জানি, পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ছবিটি দেখবো না বলে সিদ্ধান্ত নিই। অসাধারণ এই উপন্যাসটির চিত্রায়িত অনুবাদ দেখে আমার মুগ্ধতার হানি ঘটাতে ইচ্ছে হয় না। এমনকী, বইটি দ্বিতীয়বার পাঠ করার বাসনাও বাক্সবন্দী করে রেখেছি – যদি আগেরবারের মতো ভালো আর না লাগে! একই কারণে অনেক বই পুনর্বার পড়ার সাহস আজও

সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। জীবনে কতো প্রিয় জিনিস শেষ পর্যন্ত অপছন্দের ঝুড়িতে জায়গা পায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। থাক না এরকম দুয়েকটা জিনিস চিরকালের প্রিয় হয়ে!

ফিরে আসি আমার অলবানি যাত্রার ফ্লাইটে। নিজের সীটে বসেই লক্ষ্য করেছিলাম, আমার বাঁ দিকে জানালার পাশের সীটে বসেছে চশমা-পরা একটি চীনা তরুণ। চেহারা দেখে চীনাদের বয়স অনুমান করা শক্ত, তবু পোশাক-আশাক এবং ব্যাকপ্যাক দেখে ধারণা হয় ছেলেটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সীটে বসেই ব্যাকপ্যাক থেকে একটি বই বের করে পড়তে শুরু করেছে। দেখে বোঝা যায় বইটি কোনো লাইব্রেরি থেকে নেওয়া। লাইব্রেরির বইয়ের চেহারা কেন যেন অন্যরকম হয়, দেখলেই চেনা যায়।

ভদ্রতা-শিষ্টতার নিয়মের মধ্যে পড়ে না, আমার কিছু এসে যায় না, তবু নিছক কৌতূহলের বশে ছেলেটি কী বই পড়ছে মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করি। আমার সহযাত্রী কিছু টের পায় না, বইয়ে তার নিবিষ্ট পরীক্ষার্থীর মনোযোগ, অন্য কোনোদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি নিজের বইটি কিছুক্ষণ পড়ি, আবার চীনা ছেলেটির বইয়ের দিকে উঁকি দিই। আমার তো আর পরীক্ষা নেই, সুতরাং তার মতো মনোযোগী হওয়ার দরকার হয় না। আমার পড়ার ধরণটি এরকমই – একটানা বেশিক্ষণ পড়া হয় না। ছাত্রজীবনেও তাই ছিলো। অনেকক্ষণ ধরে বইয়ের পাতায় নিবিষ্ট থাকলে একসময় টের পাই, চোখ দুটি বইয়ের পাতায় থাকলেও আসলে পড়ছি না কিছুই, মাথার ভেতরে ঘুরছে অন্যকিছু। ফলে, ছোটো ছোটো বিরতি দিয়ে পড়তে হয় আমাকে।

নিয়মমাফিক এয়ার হোস্টেসরা নরম পানীয় সরবরাহ করে। আমি কফি নিই, ছেলেটি হাত বাড়িয়ে কোকের গ্লাস নেয়, কোন কায়দায় কে জানে সে তার বইয়ের নামটি এবারও আড়াল করে রাখতে সক্ষম হয়। উঁকি দিয়েও দেখতে পাই না। আমার কৌতূহল এখন রীতিমতো ঔৎসুক্যের পর্যায়ে। কী বই?

অলবানি এয়ারপোর্টে অবতরণের আগে সীট বেল্ট বেঁধে নেওয়ার ঘোষণা শোনা যায়। এবার ছেলেটি বই বন্ধ করলে আশ্চর্য হয়ে দেখি, তার হাতের বইটির নাম *দ্য আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বীয়িং*! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভাবি, কী করে সম্ভব? বিমানযাত্রায় পাশাপাশি বসা দুই অপরিচিত যাত্রীর হাতে একই লেখকের একই বই! পার্থক্য এটুকুই, আমারটি পেপারব্যাক সংস্করণ আর চীনা ছেলেটির হাতে অন্য একটি হার্ডকভার সংস্করণ। মনে হয়, স্বপ্ন দেখছি না তো?

মিলান কুন্ডেরার মতো লেখকরা এমন জনপ্রিয় কখনো হন না যে তাঁদের বই পাঠকের হাতে হাতে ঘুরবে। তাঁদের বই বেস্টসেলার হয় না। স্টিফেন কিং বা জন গ্রিশাম বা আর কোনো থ্রিলার লেখকের বই হলে এতোটা চমকিত এবং চমৎকৃত নিশ্চয়ই হতাম না। এই অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। কাছাকাছি একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার লস এঞ্জেলেস-এর অরেঞ্জ কাউন্টি এয়ারপোর্টে ফ্লাইটের অপেক্ষায় লাউঞ্জে বসে আছি। এক ভদ্রলোক এসে বসলেন আমার পাশে, হাতে গুন্টার গ্রাস-এর *মাই সেঞ্চুরি*। আমি তখন পড়ছি গ্রাস-এর *দ্য টিন ড্রাম*!

অলবানি এয়ারপোর্টে অবতরণের পর অন্যসব যাত্রীর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছি। চীনা ছেলেটিও দাঁড়ায়, সে তার বইটি ব্যাকপ্যাকে ভরে নেয়। এই প্রথম তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে সামান্য হেসে বলি, জানো তুমি আর আমি একই বই পড়ছিলাম এতোক্ষণ?

মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব আসে, আমি জানি।

একসঙ্গে দুটি বিস্ময়। তার কণ্ঠস্বর, হাসি এবং উঠে দাঁড়ানোর ফলে শরীরী বিভঙ্গ জানিয়ে দিচ্ছে চীনাটি তরুণ নয়, তরুণী। দ্বিতীয় বিস্ময়, আমার হাতের বইটি সে কখন দেখলো? তাকে তো মুহূর্তের জন্যেও তার নিজের বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলতে দেখিনি। একবার ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি। করা হয় না। মেয়েদের একটি লুকানো চোখ কোথাও থাকে, জানা ছিলো। এবার দেখা হলো। আমার এই অভিজ্ঞতার গল্পটি শুনলে আমার কুণ্ডুবাবু কী বলতেন?

ডিসেম্বর ২০০৫

email : mz1971@gmail.com